সাহিত্যসেনা

সম্পাদকীয়

সরিফুল ইসলাম

সাহিত্যসেনার পথ চলা শুরু ২০০৬ সাল থেকে। মাঝে একটি গ্যাপ তৈরি হয়েছিল। আবার ২০২৫ সাল থেকে নতুন রূপে নতুন পথে নতুন ভাবনায় সাহিত্যসেনা সবার মাঝে ফিরে আসছে। এবছর প্রথম বেরোচ্ছে 'বাঙালি ও বাঙলা ভাষা' সংখ্যা। বাঙালি বা বাঙলা ভাষার প্রতি আগ্রাসন নতুন কিছু নয়। স্বাধীনতার বহু আগে থেকে হিন্দিবলয়ের আগ্রাসনে বাঙালি ও বাঙলা ভাষা কোণঠাসা। একটা সময় জিন্না মুসলিম লিগের সর্বভারতীয় সভাপতি হলেন। তারপরই উর্দু ভাষার প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলেন মুসলিমদের মধ্যে। আর পাকিস্তান আলাদা রাষ্ট্রের মর্যাদা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই আগ্রাসন ভয়ানক হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ১৯৩৫ সালে মানভূম বিহারি সমিতি গড়ে তুলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। এই সমিতি নানাভাবে বাঙলা ভাষার প্রতি চাপ বাড়াতে থাকে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের কথা আমাদের জানা। অসমের শিলচরের ১১ শহিদের ঘটনা আজও আমাদের মনে নাড়া দেয়। আর আজ বাঙলা থেকে কিছু মানুষ আওয়াজ ওঠাচ্ছেন বাঙলাকে আরবি ও ফার্সি মুক্ত করতে হবে। বাঙলা ভাষার ইতিহাস না জেনে এই সমস্ত মানুষের কথায় সুর মেলালে বাঙলা ভাষার প্রতি যেমন অসম্মান করা হয় তেমনি বাঙলা ভাষা মুখ থুবড়ে পড়বে আগামীতে। কারণ বাঙলা ভাষা আজ শক্তিশালী হয়েছে বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দভান্ডার গ্রহণের মধ্য দিয়ে। যে ভাষার গ্রহণ ক্ষমতা নেই সেই ভাষা দুর্বল। তার জন্য প্রতিটি মানুষকে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়া দরকার। 'বাঙালি ও বাঙলা ভাষা' সংখ্যায় নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। বাঙলা ভাষা আন্দোলন, বাঙলা ভাষা প্রেম, বাঙলা ভাষার বৈচিত্র্য, বাঙলা ভাষার উৎপত্তি, বাঙলা ভাষার সমৃদ্ধি। আজ বাঙলা ভাষা বিপন্ন না বাঙলি তথা বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক বিপন্ন বিশেষ করে মুসলিম বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক ? এই রকম বহু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি সাহিত্যসেনার ' বাঙালি ও বাঙলা ভাষা' সংখ্যায়। বাঙলা ভাষা বা বাঙালিদের প্রতি যেকোনো ধরণের অন্যায় হলে লিখায় হোক আমাদের প্রতিবাদের মূল ভাষা। যাঁরা লিখা ও পরামর্শ দিয়ে সাহিত্যসেনা পত্রিকা বার করার পথ মসৃন করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে ছোটো করবো না। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

Sahityasena, a research and Creative literature oriented E-journal. Published by Farjina Parvin and edited by Sariful Islam. WhatsApp - 8617377896, Email - sahityasena@gmail.com, Website - sahityasena.com

বাঙালির ভাষাপ্রেম

দৌবারিক গোস্বামী

ভাষাপ্রেম বাঙলাসংস্কৃতির প্রধানতম অঙ্গ। কেবল বাঙলাদেশ বা শিলচরে ঘটে যাওয়া ভাষা-আন্দোলনের কথা মনে রেখে এমন সিদ্ধান্ত নয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল তথা সমগ্র বিশ্বে বাঙালির ভাষাপ্রেম নিদর্শন হয়ে আছে।

স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই হিন্দিবলয়ের ষড়যন্ত্রে বাঙলা ও বাঙালি কোণঠাসা হয়ে আছে। বিশেষ করে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লি হলে অবাঙালিদের প্রভুত্ব করবার দৌরাত্ম্য বাড়ে। জিন্না সর্বভারতীয় সভাপতি হলেন মুসলিম লিগের। উর্দু ভাষার প্রভাব বাড়াতে শুরু করলেন বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে। পাকিস্তানের জন্ম হলে সেই উর্দু-আগ্রাসন বাঙালিদের ওপর ভয়ানক হয়ে ওঠে।

অন্য দিকে মানভূম বিহারি সমিতি ১৯৩৫ সালে গড়ে তুললেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। মানভূমের বাঙালি ও বাঙলাভাষার ওপর তাঁদের অত্যাচার ক্রমাগত বেড়েই চলল। হিন্দি সাইনবোর্ড থেকে শুরু করে সরকারি ও বেসরকারি কাজের ভাষা হিন্দি করা হল। স্কুলগুলিতে হিন্দি বাধ্যতামূলক করা হল এবং প্রার্থনাসঙ্গীতে বাঙলাগানের বদলে রামধুন চালু করবার চাপ তৈরি হল। অথচ আদমশুমারি (১৯৩১)-তে দেখা গেছে মানভূম অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ হিন্দি নয়, বাঙলাভাষা বলেন।

গোবলয় কেবল নয়, সুযোগ পেলেই বাঙালি-বিদ্বেষ তীব্র হয় অন্যান্য রাজ্যেও। ধর্মকেন্দ্রিক ভারতভাগের ফলে বাঙলাদেশের উপত্যকায় বসবাস করতে বাধ্য হয়। সিলেট ঢাকা প্রেসিডেন্সির মধ্যে সংখ্যা সিংহভাগ। দেশভাগের ফলে থাকে অসমে। সিলেটের বাঙালি ও উপত্যকায় বাঙালির সংখ্যা অারো বঙ্গাল খেদা। ১৯৬০ সালে আসাম সামান্যতম অধিকারও রইল না। বাঙালিরা তাদের ভাষার মর্যাদা

সিলেটের বহু মানুষ আসামের বরাক তাছাড়া ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত কাছাড় ও থাকায় এখানে বাঙলাভাষাভাষি মানুষের সিলেট যায় বাঙলাদেশে আর কাছাড় কাছাড়ের বাঙালি সংযুক্ত হয়ে বরাক বেড়ে গেল। ১৯৫০ সালে শুরু হল ভাষা বিল পাশ হলে বাঙলাভাষার সংখ্যাধিক হয়েও বরাক উপত্যকার হারালো।

কিন্তু বাঙালির মর্যাদাবোধ কতটা তার প্রমাণ বারবারই পাওয়া গেছে। বাঙলাদেশে ১৯৪৮ সালে জিন্না ঘোষণা করেন উর্দু একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এই ঘোষণায় বাঙালি থেমে যায় নি। ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন ও ১৯৫১ সাল জুড়ে বাঙলাভাষা আন্দোলন চলে। ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় আবার ঘোষণা করলেন , 'রাষ্ট্রভাষা হইবে উর্দু'। বাঙালিরা নানা প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে ফেটে পড়েন। শেষপর্যন্ত ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বিরাট প্রতিবাদ মিছিলের মাধ্যমে পাকিস্তানি প্রশাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় বাঙালি ছাত্র-যুবশক্তি ও অন্যান্যরা। ভীত পাকিস্তানি পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেন আব্দুল জাব্বার, রফিকউদ্দিন, আব্দুল সালাম, আবুল বরকত। সার্থক হয় বাঙলাভাষা আন্দোলন।

একই ভাবে মানভূমে অত্যাচারিত বাঙালিরা চুপ করে থাকেন নি। ১৯৫৬ সালের ২০ এপ্রিল সহস্রাধিক নারীপুরুষ পুঞ্চা থেকে কলকাতার পদযাত্রা করেন। মুখ্য ভূমিকা নেন অতুলচন্দ্র ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে। বাঙালি মুখ্যমন্ত্রীও সেদিন বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যুক্ত

Sahityasena, a research and Creative literature oriented E-journal. Published by Farjina Parvin and edited by Sariful Islam. WhatsApp - 8617377896, Email - sahityasena@gmail.com, Website - sahityasena.com

ছিলেন। তাঁরা থামিয়ে দিতে পারেন নি। সিনেট হলে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সভা, সাংসদ রেণু চক্রবর্তীর এই আন্দোলনকেন্দ্রিক টুসুগানের ইংরাজি অনুবাদ, সংসদে দাঁড়িয়ে বাঙলাভাষার অধিকার নিয়ে চৈতন্য মাঝির জ্বালাময়ী ভাষণ, পুরুলিয়ার আইনজীবীদের সংগ্রামের ফলে ১৯৫৬ সালে পুরুলিয়ার ১৬টি থানা ও পূর্ণিয়া খানিকটা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আসামেও বাঙালিরা ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকার আপামর নরনারী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সামিল হন। প্রতিরোধ করে অসম রাইফেলসের ঘাতকবাহিনি। এবং নির্বিচারে গুলি চালায় ভাষা-সংগ্রামিদের উপর। প্রাণ হারান ১১জন ভাষা-সংগ্রামী। তাঁরা হলেন, হীতেশ বিশ্বাস, তরণী দেবনাথ, সুনীল সরকার, বীরেন্দ্র সূত্রধর, কানাইলাল নিয়োগী, কুমুদ দাস, শচীন পাল, কমলা ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্র দেব, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, সুকোমল পুরকায়স্থ।

ভাষার জন্য সংগ্রাম ও প্রাণবিসর্জন বাঙালি সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ! তবু দুঃখের বিষয়, হিন্দিভাষার আগ্রাসন ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আমরা বড় বেশি নির্বাক। তাই হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা বলে ওরা। এই মিথ্যা প্রচার আমরা মেনে নিই। মনে রাখতে হবে কেবল কোন একটি ভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষা নয়। সেখানে বাঙলাও একই মর্যাদার অধিকারি। হিন্দি ভাষার আজকের আগ্রাসন ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আবার গর্জে উঠুক আপামর বাঙালি।

মালদা জেলার ভাষা-বৈচিত্র্য প্রসঙ্গ

ড. আবদুল অহাব

মূলত বাঙলা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন অফিসের ভাষা হলেও মালদার লোকভাষা বা কথ্য ভাষার বিশেষত্ব এবং বৈচিত্র্য রয়েছে। একদা গৌড়-পাণ্ডুয়া বাঙলার রাজধানী হওয়ায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে বিভিন্ন ভাষার মানুষ এসে থেকে গেছে। ব্রিটিশ আমলেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ এখানে এসেছে। এমন কি স্বাধীনতার সময় ও তার পরেও পূর্ববঙ্গ হতে দেশান্তরিত মানুষের সমাগম ঘটেছে মালদায়। পশ্চিমবঙ্গের নাভিমূলে এই জেলায় তাই লোকভাষার বৈচিত্র দেখা যায়। মালদার কথ্য ভাষাগুলোর মধ্যে রয়েছে মালদাইয়া বা শেরশাবাদিয়া, খোট্টা তথা চাঁই, সূর্যাপুরী/ রাজবংশী, সাঁওতালি, কুরমালি ইত্যাদি। জি. এন. গ্রীয়ার্সনের কথায়, " Malda, as the meeting place of several languages, would form an interesting study to the comparative philologist " (Linguistic Survey of India, Vol. 5, Pt. - 1, Calcutta : 1903, P. 119)

মালদা জেলার উত্তরাংশে (চাঁচল ১ ও হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকে) সূর্যাপুরী / রাজবংশী ভাষার প্রাধান্য রয়েছে। মালদা জেলার পূর্বাঞ্চলে (হবিবপুর, গাজল, ওল্ড মালদহ ব্লকে) রাজবংশী ভাষা প্রচলিত আছে। গ্রীয়ার্সনের সময়

অবিভক্ত পূর্ণিয়া জেলার শ্রীপুরিয়া নামের ভাষাটি বর্তমানে সূর্যাপুরী নামে প্রচলিত এবং তার সঙ্গে মালদা জেলার কথ্য কোচ-বাংলা বা রাজবংশী ভাষার মিল আছে। গ্রীয়ার্সনের পর্যবেক্ষণে " Siripuria, which closely resembles the koch-Bengali spoken in Malda (Ibid)." বাংলা ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মালদা জেলার এই 'কোচ-বাংলা ' কোচবিহার-জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী ভাষার থেকে আলাদা হওয়ার কারণ হিসেবে তিনি মালদা সংলগ্ন প্রতিবেশী বিহারি ভাষার প্রভাবের কথা বলেছেন, এমন কি বেশ কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যাকরণ ওড়িয়া ভাষায় দেখা যায়, "Its grammar shows remarkable points of agreement with Oriya" (প্রাগুক্ত)।

মালদার পূর্বাংশে রাজবংশী - কামতাপুরী ভাষার মানুষদের পাশাপাশি অন্য ভাষার জনগোষ্ঠীরও সহ অবস্থান দেখা যায়। সমগোত্রীও দেশি, পোলিয়া ও কোচ/রাজবংশী এই তিন উপগোষ্ঠীর মধ্যেও ভাষার কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। এখানে সাঁওতালী, শেরশাবাদিয়া, কুরমালি এবং প্রমিত বাংলা ভাষার মানুষও বসবাস করে। এই প্রসঙ্গে গ্রীয়ার্সনের কথাটি আজও সত্য, "Curiously enough, language is much more distributed by race than according to locality, so that in one and the same village in the east of the District four or five languages may be heard spoken (Ibid)"।

মালদার উত্তরাংশ এবং পূর্বাংশে ব্যবহৃত রাজবংশী ভাষার পার্থক্য উদাহরণ দিয়ে দেখানো যেতে পারে। ২০২৩ সালে হরিশ্চন্দ্রপুরের চণ্ডিপুর থেকে স্থানীয় অধিবাসী তথা গবেষক ড. আলী রাজার নিকট হতে সংগৃহীত একটি নমুনা এটি: " ইয়েকটা লোকের দুটা বেটা ছিল। উয়ার মধ্যে ছোটো ঝন উয়ার বাপোক কহোলে, হামি যে কুনা টাকা-করির হিস্যা পামু, মোক/হামাক দে। তেখুনকাই অসাক সাঁই- সম্পত্তি বুঝাই দিলে। "পক্ষান্তরে বামনগোলার জগদলা এলাকার চাঁদপুর গ্রামের ভাষার এই উদাহরণটি ঐ সময় সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন হাই স্কুল শিক্ষক মিলন মণ্ডল: "একটা মান্-ষের দুটা ব্যাটা আছিলো। তামহার ভিতর ছোটটা তার বাপক্ কহিলি, বাপ গে, ধন-সম্পত্তির যেলা ভাগ মুই পাম, সেলা মোক দি। তার জন্যে তার বাপ তামহাক্ ধন-সম্পত্তির বেবাক্ ভাগ করে দিলি।"

মালদা জেলার বেশিরভাগ অংশে যে ভাষায় কথা বলা হয় সেটি হলো মালদাইয়া বা শেরশাবাদিয়া। এই ভাষা মালদহের লোকনাট্য ও লোকগান গম্ভীরা ও আলকাপের প্রধান মাধ্যম। এই লোকভাষা সম্পর্কে ব্রিটিশ আমল তথা মালদহ জেলার সেটেলমেন্ট অফিসার এম. ও. কাটারের Survey and Settlement Report of Malda District (১৯৩৮) গ্রন্থে উল্লিখিত মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ: "The Shersabadiyas have an intonation peculiar to themselves, the voice rising to a high pitch at the end of the sentence. This peculiarity is an unfailing source of satire at Gambhira and Alkap performanance" (কাটার পৃষ্ঠা ৪৬)। এই লোকভাষাকে ভ্রমবশত কেউ বরেন্দ্রী আবার কেউ উত্তর রাঢ়ীয় অন্তর্ভুক্ত ভাবলেও এর স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন ভাষাবিদ প্রভাতরঞ্জন সরকার তাঁর বর্ণবিজ্ঞান (Science of Language) গ্রন্থে। তিনি সমগ্র বাংলা ভাষাগুচ্ছকে ১২টি উপভাষায় ভাগ করে ৫ম স্থানে শেরশাবাদিয়া বা মালদাইয়া, ৬ষ্ঠ স্থানে বরেন্দ্রী ও ৭ম স্থানে রঙপুরিয়া (কামতাপুরী বা রাজবংশী) উপভাষাকে রেখেছেন। মালদাইয়া লোকভাষার বিস্তার, মিষ্টতা ও শ্রুতিমাধুর্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ভাষাবিদ প্রভাতরঞ্জন সরকার বলেন,-- ৫. শেরশাবাদিয়া বা মালদাইয়া বা জঙ্গীপুরী বাংলা : মুর্শিদাবাদ জেলার অধিকাংশ এলাকা, সাঁওতাল পরগনার পাকুড় ও রাজমহল, মালদহ জেলা, কাটিহার জেলার বারসোই ও পূর্বাংশের কিছু কিছু এলাকা, পশ্চিম দিনাজপুরের ডালকোলা ও রাজশাহী জেলার নবাবগঞ্জ মহকুমা।এই উপভাষার উচ্চারণ খুব সুন্দর। উচ্চারণে একটা টান বা বিশেষ ধরণের ইন্টনেশন রয়েছে। (" ভাষা ও উপভাষা -১, " বর্ণবিজ্ঞান, কলকাতা : প্রভাত লাইব্রেরী, ১৯৮৩, পৃ. ৬০)

প্রভাতরঞ্জন সরকার তাঁর 'বাংলা ও বাঙালী' গ্রন্থে শেরশাবাদিয়া ভাষার ক্ষেত্র-সীমানার মধ্যে বীরভূম জেলার নলহাটি-মুরারই থানা এলাকাকেও জুড়ে দিয়ে ইঙ্গিত করেছেন যে মালদা জেলার শেরশাবাদ পরগনায় এই ভাষার মানুষের আধিক্য থাকায় ভাষাটি এই নামে পরিচিত। (বাংলা ও বাঙালী, কলকাতা: প্রভাত লাইব্রেরী, ১৯৮৮, পৃ. ৫৫)। শেরশাবাদিয়া ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে এতে "মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ সর্বত্রই যথাযথ" -- যা বাংলার অন্য কোনো উপভাষায় এমনভাবে দেখা যায় না (প্রভাতরঞ্জন সরকারের ব্যাকরণ বিজ্ঞান, কলকাতা : প্রভাত লাইব্রেরী, ১৯৯০, পৃ. ৩৭)।

মালদহ জেলার সদর মহকুমায় ৯টি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের মধ্যে এই ৭টিতে শেরশাবাদিয়া ভাষার মানুষ বসবাস করে – ইংরেজ বাজার, ওল্ড মালদা, গাজোল, মানিকচক, কালিয়াচক-১, কালিয়াচক-২ এবং কালিয়াচক-৩ ; বাকি এই দুটি ব্লকে এদের বসতি খুবই কম রয়েছে – বামনগোলা ও হবিবপুর। চাঁচল মহকুমায় ৬টি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের মধ্যে এই ৪টিতে শেরশাবাদিয়া ভাষীদের ঘন বসতি রয়েছে – চাঁচল-২, হরিশ্চন্দ্রপুর-২, রতুয়া-১ এবং রতুয়া-২;

বাকি এই দুটি ব্লকে এদের গ্রামের সংখ্যা খুব কম রয়েছে – চাঁচল-১ ও হরিশ্চন্দ্রপুর-১। এই জেলায় বরিন্দ এলাকার চেয়ে টাল ও দিয়াড়া অঞ্চলে এদের জন-ঘনত্ব বেশি। মালদা জেলায় এই ভাষায় কথা বলা বিশেষ জনগোষ্ঠীগুলি হলো কিষান, বাদিয়া, পেঁচী, বসনি ইত্যাদি।

মানিকচকের ভূতনি এলাকায় কিষান জনগোষ্ঠীর মধ্যেকার প্রচলিত শেরশাবাদিয়া ভাষার নমুনা দিয়েছিলেন সেখানকারই বিশিষ্ট কবি সুকান্ত মণ্ডল, "অ্যাক ঝোনা মানুষের দুটা ব্যাটা আছিলো। ওরঘে/ তারঘে মধ্যে আপনা বাবাখে কৈহলে, বাবা ধোন-সম্পত্তির যে হিস্যা হামি পাবো, হামাখে দে। আর তোক্ষনি আর ওরঘে/ওঘরে সবকিছু ব্যাটা দিলে।" কিষানদের ভাষা আর কালিয়াচক-বৈষ্ণবনগর এলাকার পেঁচীদের ভাষা যে এক তারই নমুনা দিয়েছেন বৈষ্ণবনগরের কবি ও শিক্ষক আব্দুল হালিম, "এক ঝোনা মানুসের দুটা ব্যাটা আছোলো। তারঘে ভীত্রে ছোটকাটা তার বাপকে, কহিলে, বাপ্ ধনসম্পত্তির যে হিস্যা হামি পাবো, সেগ্না হামাকে দে।" শেরশাবাদিয়াতে খণ্ড উপভাষার উপস্থিতি রয়েছে, সেই কথা ভাষাবিদ প্রভাতরঞ্জন সরকার উল্লেখ করেছেন (বাংলা ও বাঙালী, কলকাতা: প্রভাত লাইব্রেরী, ১৯৮৮, পৃ. ৫৫)। কালিয়াচক-সুজাপুরে ব্যবহৃত একটি নমুনা পেশ করেছিলেন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও লেখক মহ. মনিরুল ইসলাম নাদিম, "অ্যাকটা মুন্সার দুটা ব্যাটা আহ্লো। অঘ্রে মৈধে ছোটকা আপনা বাপকে কহিলে, "বাবা, ধোনসম্পত্তির যে হিস্সা হামি পাবো, হাঁকে দিয়া দে হে! আর ঐ কথাতিই অঘ্রেখে মালমাত্তা যাত্তা আহ্লো সোব ব্যাঁট্যা দিলে।" ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে শেরশাবাদিয়া ভাষার নমুনা পাওয়া যায় হবিবপুর ব্লকের আইহো গ্রাম-নিবাসী গম্ভীরা-শিল্পী কৃষ্ণধন দাস গোস্বামী (১৮০৮-১৯১০)-র বাল্যস্মৃতিতে, "হামার বয়স বুঝি আট, বাবা পুঁথি করে পাঠ,

হামি বস্যা বস্যা শুনতুম সব।
ক' হলে কথা বাবা পাবে ব্যথা
তাই সদা থাকতুক নীরব।
বাবার কাছে ক খ গ ঘ শিখ্যাছিনু,
এগারো বারোতে পুঁথি পইড়্যা লিনু। শিশুবোধ পড়্যা পড়া করনু শেষ,
বাবা ধরিয়া দিলে বাবাজী বেশ।"

মালদহের প্রখ্যাত গম্ভীরা শিল্পী সতীশচন্দ্র গুপ্ত ওরফে সতীশ কবিরাজ (১৮৮২-১৯৭৫)-এর শেরশাবাদিয়া ভাষায় গান:

"ঐ দ্যাখ ন্যাংটা বুড়্হা সঙটা সাজ্যা ঢঙটা কইর‍্যা আছে বোস্যা।
বুড়্হা আস্ত ক্ষ্যাপা ভসম ল্যাপা বাঘের ছালটা পড়ছে খোস্যা। "

মেয়েদের গীদ (folk-song) শেরশাবাদিয়া ভাষার অমূল্য সম্পদ যা এই ভাষাটিকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। বৈষ্ণবনগর এলাকায় চাঁই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত এই শেরশাবাদিয়া ভাষার একটি গীদের কয়েকটি লাইন,

"অ্যালো রে সেন্দুর কাগজে মোড়িয়া রে
কালো রঙের ভোমরা রে।।
সে না সেন্দুর পিন্ধ্যা গে বেটি বাবার আগে ঠারি গে,
কালো রঙের ভোমরা রে।। "

গম্ভীরা ও আলকাপ ছাড়াও ইদানীং এই লোকভাষাকে টিকিয়ে রাখতে সাহিত্য চর্চা শুরু হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মালদহের স্বনামধন্য নাট্যকার বঙ্গরত্ন পরিমল ত্রিবেদী তাঁর ১১টি নাটকের সংলাপ এই ভাষায় লিখেছেন। নাটকগুলি হলো 'লোতুন জীবন', 'রতন', অমূল্য রতন, উদাস পূজা, লক্ষ্মীকান্ত, ভালো মানুষ, ব্যাল্যান্স, আজও ভালোবাসা, বোধ, গম্ভীরা গম্ভীরা ও আলকাপ মায়া। মালদহের লোকশিল্প গম্ভীরা ও আলকাপের সংকট ও সম্ভাবনাকে নিয়ে তাঁর অনবদ্য দুটি পরিবেশনা হলো গম্ভীরা গম্ভীরা (২০১২-১৩) ও আলকাপ মায়া (২০১৫-১৬)। ২০১৫ সালে ভারতের ১৭তম আন্তর্জাতিক থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে গম্ভীরা গম্ভীরা নাটকটি দিল্লী ও মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে বিভিন্ন ভাষায় প্রদর্শিত হয় এবং উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। ইংরেজি ও রুশ ভাষাতেও এটি প্রদর্শিত হয়েছে।

মালদহের লোকভাষা ও লোকসাহিত্যকে টিকিয়ে রাখতে কাজ করছে বিভিন্ন সংস্থা। মালদাইয়া ভাষা ও লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চার জন্য কাজ করছে শেরশাবাদিয়া বিকাশ পরিষদ (স্থাপিত ২০১৯) ও শেরশাবাদিয়া সাহিত্য পরিষদ (স্থাপিত ২০২২); এরা ২০২০ থেকে বের করছে লোকসংস্কৃতি চর্চার দ্বিমাসিক পত্রিকা শেরশাবাদের কাগচ। মালদহের কবি উৎপল দাস এই ভাষায় তিনটি কাব্য প্রকাশ করেছেন – মালদা জেলার লোক হামরা, এ কেমন

মানবিকতা, এবং চ্যাতন করা গঁইয়া ছড়া। মহ. আকমাল হোসেনের কাব্য হামরা কালিয়াচকের লোক, নুরুল হাসানের চিকাস কাব্য, ইবন যায়নাব (ওরফে আব্দুল অহাব)-এর কাফের কবিত্যার পোষালু, সাজিরুদ্দিন আহমেদের হাঁরঘে কবিত্যা ইত্যাদি এই ভাষার উল্লেখযোগ্য কাব্য। আবদুস সামাদের কেনে কিগোনে ও কে ধান বাহানে কুন সাহানে, তথা মহ মাজহারুল আবেদিনের ষোলোআনা শেরশাবাদিয়া ও অনচিহ্যার ফুলের কুঁড়ি কাব্যগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মালদা জেলার পশ্চিমাংশের একটি বিশেষ ভাষা হলো খোট্টাভাষা। রতুয়া, মানিকচক ও অবিভক্ত কালিয়াচকে এই ভাষার মানুষদের খাস উপস্থিতি রয়েছে। ইংরেজবাজার ব্লকেও রয়েছে কিছু গ্রাম। চাঁই, দ্বারভাঙ্গিয়া, মৈথিল ইত্যাদি জনগোষ্ঠী এই ভাষায় কথা বলেন। যখন মালদহ জেলা গঠিত হয়নি এবং মহানন্দার পশ্চিমে সমগ্র এলাকা পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেই সময় ১৮১০ নাগাদ লেখা পূর্ণিয়া অ্যাকাউন্টে ফ্র্যান্সিস বুকানন খোট্টা ভাষার বিভিন্ন উপ/খণ্ড-ভাষার প্রসঙ্গ টেনে এই ভাষার সঙ্গে হিন্দি ভাষার সম্পর্কের কথা বলেছেন,

"The emigrations have been so recent that the people have not yet moulded their discourse into one common dialect. Among the Bengalese all these dialects of the Hindi are called Khotta/Khottha or the harsh language, and in the Bengalese part of the district all the tribes from the west are usually called Khottha (Barbarophonos) (p. 171)."

কামার , কুমার ইত্যাদি পেশার মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। বাঙালিরা সেই সময় তাদের "খোট্টা কুমোর " বলত ("Khotta Kumar or harsh-tongued pot-makers," Buchanon, p. ২২০)। কর্মকারদের প্রসঙ্গেও বুকানন বলেন, "Just like the potters they are divided into four nations, and where the manners of Bengal prevail, the three western nations are included under the common degrading appellation of Khottha (220)"।

ভাষাবিদ প্রভাতরঞ্জন সরকার খোট্টা ভাষাকে দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন: (ক) দক্ষিণী খোট্টা বাংলা যা বোকারো থেকে হাজারীবাগের মধ্যবর্তী অঞ্চলে রয়েছে এবং যা বাংলা ও মাগধী ভাষার মিশ্রণ-সঞ্জাত; (খ) উত্তরী খোট্টা বাংলা যা শেরশাবাদিয়া বাংলা ও অঙ্গিকার বিমিশ্রণ (প্রভাতরঞ্জন সরকারের ব্যাকরণ বিজ্ঞান, কলকাতা: প্রভাত লাইব্রেরী, ১৯৯০, পৃ. ৩৭)। মালদা জেলার খোট্টা ভাষার একজন কবি অভিজিৎ মালাকারের "হাম্মার শিক্ষক দিবাস " কবিতাটির কয়েকটি লাইন দিয়ে এই ভাষার নমুনা পেশ করা হলো :

"কাখনিও সোচিকে দেখনা
গাঙ ক এন্তা পানি কাঁহামে যা
এন্তা পানি কাঁহাসে আবা
নাই দেখনা কাভিও তোরসানি
ঠিক কি নাই?

হাম্বারসানি কে
আপ্পান জীবন ভী
ঐ রাকম কারিকে বারহাল যা
কাভিও সুখ আবা, তো কাভিও দুখ।"

এই ভাষার একটি লোকছড়া:

"ইচিং বিচিং চান চিচিং
চানকে বেটা ল্যাক্ষিন্দর
সাজিকে আলাই ডামাডোল
ডামাডোলকে ঘ্যারকে ভিত্যার
জোড়া জোড়া ক্যাবুত্ত্যার ।"

এটি শেরশাদিয়া ভাষার এই ভাবে রয়েছে যা তুলনীয় :

"ইঁটকি বিঁটকি চান চিঁটকি
চান্দের বেটা লখিন্দর
সাজ্যা আইলো ডামাডোল
ডামাডোলের বাড়ির ভিতর
জোড়া জোড়া কবিতের "।

মালদা জেলার খোট্টা ভাষার লোকচর্চার একটি বিশেষ অঙ্গ হলো ডোমনি গান। ডোমনি নিয়ে যুগান্তকারী বই লিখেছিলেন মানিকচকের প্রাক্তন তথা প্রয়াত বিধায়ক সুবোধ চৌধুরী। তাঁর 'ডোমনি' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৯ সালে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা হতে। ড. দেবশ্রী পালিতের লেখা মালদা জেলার ডোমনী গান: সাম্প্রতিক সমীক্ষা ও ডোমনি গান: সীমান্তে ও সীমান্ত পেরিয়ে বই দুটি বেরিয়েছে ২০১২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ (কলকাতা) হতে। খোট্টা তথা চাঁই ভাষার ওপর পি. এইচ. ডি. গবেষণা গ্রন্থ লিখেছেন পতিত পাবন চৌধুরী। তাঁর লেখা এই ভাষার কাব্যগ্রন্থ দউড়। খোট্টাভাষা চর্চার জন্য মানিকচক শিক্ষানিকেতনের অবসরপ্রাপ্ত তথা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক জ্যোতিভূষণ পাঠক এর নেতৃত্বে তৈরি হয়েছে খোট্টাভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ কমিটি (২৮ নভেম্বর ২০২১) ও প্রকাশিত হচ্ছে ড. অমর কর্মকার সম্পাদিত 'প্যাছিয়া বাতাস' পত্রিকা (২০২২)। 'খোট্টা বোলি' কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন জ্যোতিভূষণ পাঠক। খোট্টা ভাষার দুটি উপন্যাস 'হ্যরিপুরনি' ও 'জ্যহির বোঙভি চোর হ্যলে ' লিখেছেন অমর কর্মকার।

মালদা জেলার সকল ভাষা নিয়ে এই স্বল্প পরিসরে লেখা সম্ভব নয়। মুখ্য তিনটি ভাষার কিছু কথা তুলে ধরা হলো মাত্র। শেষে একটি সুখবর দিয়ে সমাপ্তি টানব। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীন ইনস্টিটিউট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ গত ১৯-২০ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে নিউটাউনের 'রবীন্দ্রতীর্থে' যে ভাষা মেলার আয়োজন করেছিল, সেখানে শেরশাবাদিয়া ও খোট্টা ভাষার স্বীকৃতিস্বরূপ শেরশাবাদিয়া ভাষার প্রতিনিধি হিসেবে এই জেলার অধ্যাপক আব্দুল অহাবকে এবং খোট্টা ভাষার প্রতিনিধি হিসেবে এই জেলার অধ্যাপক অমর কর্মকারকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। দুজনই ভাষা দুটিকে তুলে ধরেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা তথা মহীশূরে অবস্থিত 'সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস' এর সহযোগে হয়েছিল উক্ত ভাষামেলা। আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে জীবন্ত রাখতে ও বিকশিত করতে এই ধরনের চর্চা ও সরকারি সহযোগিতার ভীষণ প্রয়োজন।

ভারতে মাতৃভাষা চর্চার সংকট ও হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ

ড. জীবনকুমার সরকার

আমাদের দেশে বর্তমান হিন্দুত্ববাদের ধ্বজা কতটা উড্ডীন এবং কী তার কুৎসিত চেহারা, তা ধর্মান্ধ ব্যতীত সকলেই জেনে গেছেন

নিরপেক্ষ বাঙালিরা যখন দেখে বিব্রত হচ্ছেন, তখন তারা লক্ষ কত ভয়ঙ্কর। ভারতে হিন্দি হাতিয়ার এখন হিন্দি ভাষা। সর্বত্র গায়ের ভাষা। হিন্দি সম্প্রসারণবাদের প্রবক্তারা রাষ্ট্র ভাষা, তাই ক্ষতি কিছু নেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। বলে কিছু নেই। আছে জাতীয় ভাষা। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের এই ২২টি ভাষা সমান এর মধ্যে কোনো একটি ভাষাকে রাষ্ট্রের অসাংবিধানিক। অথচ আমাদের দেশে যে কোনো সাইনবোর্ড, চাকরির পরীক্ষা হিন্দির রমরমা। এর রাজনৈতিক ও ভাষিক আধিপত্যবাদের কৌশলটি জানা দরকার।

মোটামুটি। ভারতের মাটিতে ধর্ম হিন্দুত্বের উগ্র সাম্প্রদায়িক রূপ করছেন না যে হিন্দিত্ব আরও সাম্রাজ্যবাদীদের সবচেয়ে বড়ো জোরে চাপানো হচ্ছে হিন্দি সবসময় বলে থাকেন- হিন্দি বাস্তবে তা নয়। আমাদের দেশ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রভাষা বর্তমান জাতীয় ভাষা ২২টি। অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবে। পক্ষে অধিক গুরুত্ব দেওয়া সেটাই হচ্ছে। সরকারি বিজ্ঞপ্তি, এবং ইন্টারভিউ সবেতেই

অবিভক্ত ভারতে শেষ জনগণনা হয়েছিলো ১৯৩১ সালে। সেখানে যেটা পাওয়া যায় — পশ্চিমি হিন্দিভাষীর সংখ্যা ছিলো ৭.২ কোটি (এর মধ্যে আবার অনেকেই উর্দুও বলতো) এবং বিহারী বলে যাদের চিহ্নিত করা হয়েছিলো

সংখ্যা ছিলো ২.৮ কোটি। এই দুটি যোগ করলে দাঁড়ায় ৯.৪ কোটি। তখন কিন্তু ১.৪ কোটি রাজস্থানি ছিলো পৃথক। আরও অনেকগুলো ভাষাই ছিলো পৃথক মর্যাদায় আসীন। আর বাঙালির সংখ্যা ছিলো এককভাবেই ৫.৩ কোটি। দেশভাগের (নামেই দেশভাগ। আসলে ভাগ হয়েছে বিপ্লবী বাংলা আর পাঞ্জাব) পর ১৯৫১ সালের জনগণনায় হিন্দি, পাঞ্জাবি, বিহারী, উর্দু, রাজস্থানি ইত্যাদি মিলিয়ে হিন্দিভাষীর দেখানো হলো ১৫ কোটি। বাঙালির সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ালো ২.৫ কোটি। আরো সাংঘাতিক ব্যাপার দেখুন — ১৯৬১ সাল থেকে ২০১১ সালের জনগণনায় এসে হিন্দিভাষীদের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৩০.৩৯ শতাংশ থেকে ৪৩.৬৩ শতাংশে। এমন ঊর্ধ্বগতির কারণ কী? এর কারণ হচ্ছে ভাষিক আধিপত্যবাদের গোপন ছক।

ভারতের উত্তর ও পশ্চিম অংশের অনেক ভাষা ও উপভাষাকে হিন্দির দখলে আনা হয়েছিলো। যেমন, ১৯৬১ সালে অওধি, ব্রজভাষা, বাগেলখান্ডি, বুন্দেলখান্ডি, ছত্তইসগঢ়ই, খড়িবলি ইত্যাদি ১০টি স্বতন্ত্র মাতৃভাষাকে হিন্দি বলে চালানো হলো। এইভাবে ভোজপুরি, বানজারা,গাড়োয়ালি, ঘুমাওনি, গোজরি, পাহাড়ি, সদ্রি সহ আরও ৪৮টি আলাদা ভাষাকে ১৯৭১ সালে হিন্দি বলে গ্রহণ করা হলো। হিন্দির অভ্যন্তরে ঢুকে যাওয়া এইসব ভাষার বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতরা রাষ্ট্রের কাছে দাবি জানিয়েছিলেন স্বাধীন ভাষার মর্যাদা চেয়ে। দুঃখের বিষয়, আজও তার কোনো সুরাহা করেনি সরকার। হিন্দির দখলে চলে যাওয়া ভারতীয় অন্যান্য ভাষাগুলো ভাষিক অধিকার ফিরে পেলে হিন্দিভাষীর সংখ্যা এইমুহূর্তে ৪৩.৬৩ শতাংশ থেকে কমে গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ২৫ শতাংশের কাছাকাছি। হিন্দিত্ব কতটা ভয়ঙ্কর এইসব তথ্যে বোঝা যায়। এই পরিস্থিতির সঙ্গে আরও একটি বিষয় যুক্ত হবার ফলে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ আরও তরতরিয়ে প্রসারিত হচ্ছে। সেটা হচ্ছে চাকরির সুযোগ-সুবিধা পেতে অ-হিন্দিভাষীরা নিজেদের হিন্দিভাষী পরিচয় দিচ্ছেন। হিন্দু ও হিন্দিত্ববাদীরা উল্লেখ করবেন হয়তো এই বলে যে, সংবিধানের ৩৫১ নং ধারায় হিন্দি ভাষার সমৃদ্ধির কথা বলা আছে। তারা আবার এটা ভুলে যান যে, সংবিধানে উল্লেখ আছে — অহিন্দি ভাষার রক্ষণা-বেক্ষণের কথা। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। গত দুই দশক ধরে হিন্দি ভাষার যে আস্ফালন দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হওয়াই স্বাভাবিক — এটা হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আরও একটি উৎকট সমস্যার কথা বলবো, হিন্দি বলয়ের মধ্যে মানুষের শিক্ষার হার কম এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ। যার ফলে অর্থনীতিবিদরা হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলোকে 'বীমারু' বলে চিহ্নিত করেছেন। 'বীমারু' শব্দের অর্থ হলো জরাগ্রস্ত। ভারতের অন্য সব রাজ্যে শিশু জন্মের হার নিয়ন্ত্রণে এলেও হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলো তা করতে পারেনি। ফলে দিনের পর দিন হিন্দি বলয়ের জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং বাড়ছে হিন্দিভাষীর সংখ্যা ও হিন্দিভাষার দাপট। এইভাবে বিপুল সংখ্যক হিন্দিভাষীদের বৃদ্ধির ফলে অন্যান্য ভাষাগুলো ক্ষীণ হয়ে পড়ছে। এই উৎকট সংকটের মধ্যে বাংলা ভাষা কোনোরকম করে ৮.২ শতাংশ নিয়ে হিন্দির পরেই দ্বিতীয় স্থানে টিকে আছে। বাঙালিকে আরও নিঃশেষ করার জন্য অনুপ্রবেশের ঢাক পেটানো হচ্ছে। অতি আশ্চর্যের বিষয় হলো, হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীদের তৈরি করা এই ঢাকের আওয়াজে বাংলার বাঙালিরা কান দিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনছেন। হিন্দিত্ববাদীরা জানেন তাদের সাম্রাজ্যবাদ একচেটিয়াভাবে টিকিয়ে রাখতে গেলে বাঙালি আর তামিলভাষীরা বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, বাঙালিদের আছে মাতৃভাষা রক্ষা করার জন্য রক্তদানের মতো সুমহান ঐতিহ্য আর তামিলদের আছে কঠোর প্রতিবাদ ও মাতৃভাষাপ্রেম। অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হলো, বাংলার বাঙালিরা আর মাতৃভাষা ও মাতৃসংস্কৃতি বিষয়ে সচেতন নয়। বাংলার রাজধানী কলকাতায় এখন হিন্দিভাষীদের ভালো দাপট। বাঙালিরাও তাদের সাথে জমিয়ে হিন্দিতে কথা বলে। বাংলার মাটিতে অবস্থিত রেলওয়ে স্টেশন এবং ব্যাংকগুলোতে ঢুকলে আর মনে হয় না এটা বাংলা প্রদেশ। বাংলার বাঙালিদের ঔদাসীন্যেই বাংলায় দিন দিন বেড়ে চলেছে হিন্দিভাষার ব্যাপক প্রভাব। হিন্দির গোলামী করা বাঙালিরা কি আর রক্ষা করবে মাতৃভাষার অধিকার? তাই তামিলরাই আজ ভারতে বড়ো ভরসা হিন্দির ভাষিক আধিপত্যবাদ রুখে দেবার ক্ষেত্রে। এইজন্য ভারতের মানুষ আজ তামিলদের বেশি সমীহ করে। একসময় যা বাঙালিদের করতো। বাঙালি জাতি যেদিন থেকে মাতৃভাষা ও মাতৃসংস্কৃতি বিমুখ হয়েছে, সেদিন থেকেই ভারতে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অবলুপ্তির পথ প্রশস্ত হয়েছে।

আরও একটি বাস্তব সমস্যার কথা স্মরণ করা দরকার, হিন্দি বলয়ে বা গাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং তার কাছাকাছি এলাকার এক বৃহৎ অংশের মানুষকে হিন্দি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা না জানলেও চলে। আমাদের দেশের আর বিশেষ অঞ্চল ছাড়া অন্য রাজ্যের মানুষদের মূলত ৩টি ভাষা শিখতে হয় — মাতৃভাষা, ইংরেজি এবং হিন্দি। ৩টি ভাষা জানার পড়েও সর্ব ভারতীয় স্তরে হিন্দিভাষীদের সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি কোনো চাকরিতেই অন্য ভাষাভাষীর মানুষেরা পেরে উঠছেন না। এর মূল কারণ ওই ভাষা রাজনীতি। হিন্দিবলয়ের মানুষদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে যাচ্ছে হিন্দি জানার ফলেই। কারণ, তাদের অঞ্চলগুলোতে অন্য ভাষা না জানলেও চলে। একইভাবে সর্ব ভারতীয় স্তরের

পরীক্ষাগুলোতে প্রশ্নপত্র থাকছে একইসঙ্গে ইংরেজি আর হিন্দিতে। একজন পরীক্ষার্থীর যে কোনো একটি ভাষা অবলম্বন করলেই চলে। খুব স্বাভাবিভাবেই হিন্দিভাষীরা তাদের মাতৃভাষায় পরীক্ষা দিতে গিয়ে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে, যা অন্যদের বেলায় হয়ে যাচ্ছে অসুবিধার কারণ। জাতীয় স্তরের পরীক্ষাগুলোতে সরকারের এই ভাষানীতির ফলে জাতীয় স্তর থেকে পিছিয়ে পড়ছে অন্য ভাষার মানুষ। ধীরে ধীরে ভাষাকে হাতিয়ার করে দেশের সব রাজ্য দখল করে ফেলছে উত্তর ভারতের প্রভুত্ববাদী হিন্দু- হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ। একটা সময় ছিলো যখন হিন্দি বলয়ের লোকেরা ইংরেজি অল্প জানার কারণে লজ্জিত হতেন, এখন আর সেটা হয় না। বরং, একমাত্র হিন্দি জানাতেই তারা আত্মশ্লাঘা বোধ করেন। কারণ, নব্য হিন্দুত্ববাদীরা হিন্দি ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা করে দিয়েছেন। তাদের চেতনায় এটা ঢোকাতে পেরেছে — হিন্দি রাষ্ট্রভাষা,পবিত্র ভাষা এবং হিন্দুত্ববাদের সর্ব ভারতীয় প্রবক্তারা সবাই হিন্দিভাষী। ফলে নির্ভেজাল হিন্দু হবার লোভে আমাদের রাজ্যের বাঙালিরাও দেখি নিজেরা হিন্দিতে কথা বলে। যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হলো — যারা একবিন্দুও হিন্দি জানে না, তারাও হিন্দির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। 953

হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ ও হিন্দুত্ববাদ মিলেমিশে একাকার। বরং এই মুহূর্তে হিন্দুত্ববাদের চেয়ে হিন্দিত্ব বেশি ভয়ঙ্কর। উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি হিন্দুত্ববাদের ধ্বজা উড়িয়ে যেখানে যেখানে ঢুকতে পারছেন না, সেখানে সেখানে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে হিন্দি ভাষা। ভাষা-সংস্কৃতি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। যেমন: বাংলায় নবজাগরণ, তামিলনাড়ুতে দ্রাবিড় সত্তার আন্দোলন এবং কেরালায় শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে হিন্দুত্ববাদীরা ধর্মকে ব্যবহার করতে পারছে না। ফলে এইসব রাজ্যে হিন্দিভাষাকে প্রসারিত করা হচ্ছে। এই রণনীতিতে হিন্দিত্ব অনেকটা সফল। সতর্ক না হলে আরও সফল হবে। আরও ফসল তুলবে। দুঃখের বিষয় হলো, যারা কঠোর হিন্দুত্ববাদ বিরোধী; ভাষা রাজনীতি বোঝেন না বলে তারাই আবার হিন্দিত্বের পক্ষে। তাই দিল্লি থেকে হিন্দিভাষী সব নেতারা বাংলাকে প্রেম দিতে এসে হিন্দিতে দাপিয়ে কথা বলে যাচ্ছেন। একফোঁটাও বাংলা বলেন না। হিন্দি বলয়ের সব রাজনৈতিক দলই চায় কেন্দ্রে হিন্দিভাষীরা শাসন করবে। এবং ভারতের বহুত্ববাদকে প্রতিদিন ধ্বংস করা হচ্ছে। হিন্দি অঞ্চলের ভারতের প্রায় ৫৬ শতাংশ মানুষকে গোঁড়া হিন্দিপ্রেমীরা এবং হিন্দুত্ববাদীরা ঘিরে ফেলছে। সংবিধান প্রদত্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেশের সুমহান বৈচিত্র আর আঞ্চলিক সভ্যতাকে 'হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুত্ব'-এর প্রবক্তারা ধ্বংস করে চলেছে। আর বাঙালিদের মাতৃভাষা রক্ষার রক্তদানের ঐতিহ্য থাকতেও নিজেদের ছোটো করে ফেলছে। 1133

ভাষা রাজনীতির এই সংকট থেকে উত্তরণের উপায় কী? একমাত্র উপায় মাতৃভাষা ও মাতৃসংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরা। কিন্তু ভারতবঙ্গের শহুরে এলিট বাঙালিরা কি আর এতটা নিচে নামতে প্রস্তুত আছেন? জায়গাটা খুব জটিল। ধনী বাঙালির মনস্তত্ত্ব খুব জটিল। বাংলাভাষা আর তাদের কাছে শ্রদ্ধার নয়। তারা আগে গোপনে বাংলাভাষার বিরোধিতা করতো, এখন সেটা প্রকাশ্যেই করে। দুঃস্থ ও গরিব বাঙালিরা এটা করে না। কারণ, গরিব বাঙালিদের প্রত্যাশা বিস্তৃত নয়। পক্ষান্তরে ধনী বাঙালির প্রত্যাশা সীমাহীন বিস্তৃত। তারা বুঝে গেছে সীমাহীন প্রত্যাশা বাংলাভাষা পূরণ করতে পারবে না। দেশের মধ্যে দরকার হিন্দি আর বিদেশে পারি দিতে দরকার ইংরেজি ভাষা। এই দুই ভাষা তাদের দিতে পারে আর্থিক বল ও অনন্য শক্তি, যা দিয়ে আশপাশের গরিবদের আরও পেছনে ফেলে দেওয়া যাবে। এই উৎকট ধারণাও মাতৃভাষা চর্চার সংকট আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সুতরাং, যে বাঙালির যত টাকা, সে বাঙালি তাতো বাংলাভাষা বিরোধী। কলকাতায় এই ছবিটা দিন দিন বাড়ছে। অতি সাম্প্রতিক কালে বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তীর গানের আসরে সরাসরি দর্শক আসন থেকে একজন বলে বসেন চিৎকার করে — আপনি বাংলা গান বাদ দিয়ে হিন্দি গান করুন। কী দুঃসাহস! ভাবা যায়? হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ একদিন কলকাতার বুকে ওই দর্শকের দাবি পূরণ করে দিলে অবাক হবার মতো কিছু থাকবে না। কলকাতার বাঙালিরা তাই চায়। আমরা আশ্চর্য হচ্ছি এসব কাণ্ডকারখানা দেখে দেখে! এর শেষ কোথায়? ব্রিটিশ তাড়ানো বাঙালিরা সব গেলো কোথায়?

ভারতের মাতৃভাষাগুলোকে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে রক্ষা করতে গেলে প্রতিটি রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আমাদের রাজ্য সেদিক থেকে আজও সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারছে না। আজও সর্বত্র বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা গেলো না। সমস্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষায় চালু করতে পারলো না। রাজ্যের মুখ্যভাষা বাংলাকে আজও সব ধরনের বিদ্যালয়ে অন্তত একশো নম্বরের একটি বিষয় হিসাবে পঠন-পাঠনে বাধ্যতামূলক করতে পারলো না। ভিন্ন রাজ্য থেকে বাংলার নানা দপ্তরে চাকরি করতে আসা অবাঙালিরা দাপিয়ে হিন্দি বলে যাচ্ছে বছরের পর বছর এবং কোনো অফিসে হিন্দিভাষী কর্মচারী যদি একজনও থাকেন, তাহলেও সে অফিসে গেলে মনে হয় না তখন বাংলায় অবস্থিত কোনো অফিসে এসেছি। এছাড়াও রাজ্যের সর্বত্র বাড়ছে হিন্দিভাষী রাজনৈতিক নেতাদের দৌরাত্ম্য, যা হিন্দিভাষী রাজ্যে গিয়ে একজন বাঙালিও করতে পারবে

Sahityasena, a research and Creative literature oriented E-journal. Published by Farjina Parvin and edited by Sariful Islam. WhatsApp - 8617377896, Email - sahityasena@gmail.com, Website - sahityasena.com

না। বলা ভালো, তাকে করতে দেওয়া হবে না। আমাদের রাজ্যের শিল্পাঞ্চলগুলোতে দেখুন, পাহাড়ে দেখুন হিন্দিভাষী রাজনৈতিক নেতাদের কী মারাত্মক প্রভাব। মূলত তারাই ওইসব এলাকার রাজনীতির নিয়ন্ত্রা। ফলে এতে বাংলা ভাষার সমূহ ক্ষতি হচ্ছে। এমনই অবস্থা আজ কলকাতার, যে হিন্দি না জানলে একটি পান-বিড়ি-সিগারেটের ঘুমটি পর্যন্ত চলে না। আগামীদিনের জন্য এটা বিরাট ক্ষতির ইঙ্গিত। রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে চূড়ান্তভাবে নজর দিতে হবে বিনা শর্তে।

আমাদের রাজ্যে সারা বছর নানা রঙের নানা বর্ণের সাংস্কৃতিক উৎসব আছে, নানা মেলা আছে। জেলায় জেলায় বইমেলা আছে। এমনকি কলকাতার মতো বৃহৎ আন্তর্জাতিক বইমেলাও আছে। শিল্পমেলা ও বাণিজ্য মেলা আছে। আছে ধর্মীয় উৎসবে টাকা ঢেলে মানুষকে মধ্যে যুগের সুতোয় বেঁধে দেবার চেষ্টা। নেই শুধু বাঙালির মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্য এতটুকু প্রয়াস। আমাদের মাতৃভাষা যদি না বাঁচে, তাহলে মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য পড়বে কে? বাঙালির শিল্প-সাহিত্য-বাণিজ্য বহন করবে কারা? আমরা কি সে ধরনের উত্তর প্রজন্ম তৈরি করে যাচ্ছি, যাদের চেতনায় ও মগজে থাকবে মাতৃভাষা ও মাতৃসংস্কৃতির জন্য সুসামঞ্জস্য বোধ? অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে বলতে হচ্ছে, হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ বঙ্গসংস্কৃতিতে থাবা মেরে বাঙালির মাতৃভাষাবোধ হরণ করেছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে চলছে হিন্দি ভাষার দানবীয় আগ্রাসন। ওইসব রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষার বাচিকরা হাতপা ছেড়ে দিয়ে হিন্দি ভাষাকে করেছে আলিঙ্গন। তার মধ্যে বাঙালিরা অন্যতম। এবং নিজেদের ভাষা ছেড়ে হিন্দিপ্রেম দেখাতে গিয়ে খুব লাভ কিছু তো হয়ইনি, বরং ক্ষতি হয়েছে অনেক। আসাম প্রদেশের উদাহরণই যথেষ্ট। আজ লক্ষ লক্ষ বাঙালির উপর চলছে ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও নাগরিকত্বের ইস্যুতে চরম আগ্রাসন। ২০১৯ সালের ৩১ আগস্ট এনআরসির তালিকা প্রস্তুত করে প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষকে এনআরসি তালিকার বাইরে রেখে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ১৬ লাখ মানুষই বাঙালি। এছাড়াও আসামের ৬ টি ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি হয়ে আছে অনেক বাঙালি। আছে 'ডি ভোটার' -এর নামে বাংলাদেশী অভিযোগ তুলে নির্যাতন, হয়রানি, সর্বস্ব লুট করার চক্রান্ত। এসব দেখেও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা কী ভয়ঙ্করভাবে নিশ্চুপ! ভাবা যায় না! সার্বিকভাবে বাঙালিদের মধ্যে এই নিয়ে কোনো আন্দোলন নেই। কোনো আলোড়ন নেই। শুধু আছে বাঙালিদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান নিয়ে জাত শেয়ালের হুক্কাহুয়া।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের পেশা ও ভাষা : একটি সমীক্ষা

ড. হজরত উমার ফারুক

পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য আবহমান কাল ধরেই চলছে মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম। একদা ভারতবর্ষে জাতি ও বর্ণভেদ প্রথা ছিল সমাজ ব্যবস্থার মূল কাঠামো স্বরূপ। উচ্চবর্ণের মানুষ ছিলো রাষ্ট্র পরিচালনা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মূল নিয়ন্ত্রক। নিম্নবর্গের মানুষের কাজ উচ্চবর্ণের মানুষের আজ্ঞাবহ হয়ে সেবা করা।

জাতির সঙ্গে পেশার এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যদিও উত্তর আধুনিককালে জাতিগত পেশায় বৈচিত্র দেখা গেছে। মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির অবস্থান বর্তমান সমাজব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। সাম্যবাদের ভাবনায় যা শাসক ও শোষিত শ্রেণি। আপন অধিকার থেকে বঞ্চিত শ্রেণিকে আমরা নিম্নবর্গ বলতে পারি। নিম্নবর্গের অবস্থান বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে ডোম,শবর, চণ্ডাল সহ অন্যান্য নিম্নবর্গ বা অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবন চিত্র বাস্তবসম্মতভাবে চিত্রিত হয়েছে।

Sahityasena, a research and Creative literature oriented E-journal. Published by Farjina Parvin and edited by Sariful Islam. WhatsApp - 8617377896, Email - sahityasena@gmail.com, Website - sahityasena.com

পরবর্তীতে মঙ্গলকাব্য,জীবনী সাহিত্য, নাথ সাহিত্য সহ মধ্যযুগের কাব্যধারা বেয়ে আধুনিক কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবন ও চালচিত্র বর্ণিত। বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে নিম্নবর্গের জীবনকথা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। রবীন্দ্র সমসাময়িক কালে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছোটগল্প রচনায় আপন স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ছোটগল্পের ভাঙ্গা গড়ার কালে তিনি ছোটগল্প রচনা করে বাংলা ছোটগল্পকে একটা শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। বিষয় নির্বাচন, চরিত্র চিত্রণ ও আঙ্গিক গঠনে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন শ্রেণি,বর্ণ ও পেশার মানুষ তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। "প্রভাতকুমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লেখক।"[১]

তিনি তাঁর ছোটগল্পে সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। সমাজের উচ্চবর্ণের পাশাপাশি নিম্নবর্গের জীবনালেখ্য রচনায় তিনি মুন্সীআনার পরিচয় দিয়েছেন। বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে তাঁর গল্পে। নিম্নবর্গের মানুষের পেশা ও ভাষা তিনি বাস্তবসম্মতভাবে ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। তাঁর 'হীরালাল', 'প্রেম ও প্রহর' ,'দুধ মা', 'বন্য শিশু' গল্পে নিম্নবর্গের জীবন কথা চিত্রিত। এছাড়াও 'বিষবৃক্ষের ফল', 'পত্নীহারা', 'কুড়ানো মেয়ে', 'হতাশ প্রেমিক', ' বলবান জমাতা', ' হারাধন' সহ অন্যান্য ছোটগল্পে নিম্নবর্গের পেশা ও ভাষার বাস্তবসম্মত প্রয়োগ লক্ষণীয়। আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে তাঁর নির্বাচিত কিছু ছোটগল্প আলোচনা করা হলো।

হীরালাল:

প্রভাতকুমারের 'হীরালাল' গল্পটি তাঁর 'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থে সংকলিত হয় ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে। গল্পটি 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই ছোটগল্পের প্রধান চরিত্র হীরালাল। সে নিম্নবর্গের ডোম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তার পরিচয় দিয়েই গল্পের সূচনা হয়েছে ।

"হীরালাল জাতিতে ডোম। বৃদ্ধ হইয়াছে, বয়স ৬০ বৎসরের কম হইবে না, আকার খর্ব, দেহখানি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, অধিক স্থূলও নহে। কিন্তু এত বয়স হইলেও তাহার দেহে এখনও বল আছে।...

গ্রামখানির নাম মাণিকপুর। গ্রামের যেটা ডোমপাড়া, যেখানে অন্যান্য ডোমদের বাস, সেখানে হীরু থাকে না। গ্রামের অপর প্রান্তে, শ্মশান হইতে অল্প দূরে একখানি মাটির ঘরে সে একাকি বাস করে।" [২]

হীরুর স্ত্রী, সন্তান কেউ নেই। সকলেই গত হয়েছে। কথিত আছে ভূতের সঙ্গে তার বিশেষ ভাব রয়েছে। গভীর রাতে তার সঙ্গে ভূতের কথোপকথন হয় তাই সে ডোমপাড়ায় না থেকে লোকালয় থেকে দূরে শ্মশানের কাছে বসবাস করে। সে ওষুধপত্র, তন্ত্র মন্ত্রও জানে। আশেপাশের গ্রামের লোকজন বিভিন্ন রোগের জন্য তার কাছে ওষুধ নিতে ও ঝাড়ফুঁক করতে আসে। একদিন রাত ১১ টা নাগাদ এক স্ত্রীলোক হীরুর বাড়িতে ওষুধ নেওয়ার জন্য আসে। সেই স্ত্রীলোক বললো-

" শেয়ালের বড় উপদ্রব হয়েছে,বুঝেছ! রান্নাঘরের বেড়া ফাঁক করে, রোজ রাত্রে শেয়াল ঢুকে, আমার হাঁড়ি খেয়ে যায়। দুটো শেয়াল মরে, এই রকম খানিকটা বিষ তুমি আমায় দিতে পারো?"[৩]

এই স্ত্রীলোকের কথাবার্তা ও আচার-আচরণে হীরুর মনে সন্দেহ হয়। সে চড়া দামে তাকে বিষ দেয়। বিষ নিয়ে স্ত্রীলোক চলে গেলে হীরু তার অনুসরণ করে। স্ত্রীলোক এক ব্যক্তিকে নিয়ে গ্রামে এক বাড়িতে প্রবেশ করে। এই মহিলা বিনোদলালের স্ত্রী নীরদা। তার স্বামী দুইবছর ধরে বিদেশে কর্মরত। সে তার চার বছরের একটি পুত্র সন্তানকে নিয়ে বাড়িতে থাকে। এক মাসের ছুটি নিয়ে বিনোদ বাড়ি ফিরছে । এরপর গল্প নতুন মোড় নিয়ে পরিণতির দিকে এগিয়েছে। হীরু রাতে প্রাচীর টপকে বিনোদের ঘরে প্রবেশ করে। এত রাতে তাকে দেখে নীরদা অবাক হয়ে বললো-

" হীরু তুই চোরের মত এখানে কি করছিস? বাড়ি ঢুকলি কি করে?

হীরু বলিল, পাঁচিল টপকে এসেছি। কাল অষুধ নিয়ে এলে ওষুধের ফলটা কিরকম হলো তাই দেখতে এসেছি।" [৪]

এই কথা শুনে নীরদা বিস্মিত হয়ে বলে, ওষুধ কোন কাজ করছে না। ওষুধ কাজ না করার কারণ হীরু বিষের গুঁড়ো না দিয়ে রাতের বেলা ভুল করে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল। তাই বিনোদ নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। নীরদা, হীরুকে বলে সে তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। হীরু যে জবাব দেয় তাতে নিম্নবর্গের ভাষার বাস্তব নিদর্শন মেলে। সে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল-

" হ্যাঁ-লো হারামজাদি শয়তানী নচ্ছারনী! হ্যাঁ! তোকে ফাঁকি দিয়েই তো টাকা নিয়েছি। এখন আমি যে জন্য এসেছি তা বলি শোন। নে, তোর গয়না কাপড় বাক্স থেকে বের করে, পুঁটুলি বেঁধে নে। তোকে, আজ রাত্রেই কলকাতায় যেতে হবে।"[৫]

হীরুর প্রস্তাবে রাজি না হলে সে বিনোদকে সব বলে শোরগোল শুরু করে দেবে। একপ্রকার বাধ্য হয়েই নীরদা হীরুর সঙ্গে কলকাতা যাওয়ার উদ্দেশ্যে স্টেশনের দিকে রওয়ানা দিল। পরদিন বিনোদ তার স্ত্রীর পদস্খলনের বিষয় জানতে পেরে জমিজামা বিক্রি করে ছেলেকে নিয়ে অমৃতসরে চলে গেল। এভাবে গল্পের সমাপ্তি ঘটে।

আলোচ্য গল্পে গল্পকার প্রভাতকুমার নিম্নবর্গের হীরালালকে প্রধান চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন। নীরদাকে একজন খল চরিত্র হিসেবেই পাঠক গল্পে পেয়েছে। সে উচ্চবর্ণের গৃহবধূ হলেও তার স্বভাব চরিত্রে নিম্নরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রেম ও প্রহার:

প্রভাতকুমারের 'প্রেম ও প্রহার' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায়। পরবর্তীতে গল্পটি তাঁর 'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থে সংকলিত হয়। আলোচ্য গল্পটি নিম্নবর্গের এক দম্পতির কলহ বিবাদ, বিচ্ছেদ ও মিলনের ঘটনা নিয়ে রচিত। গল্পের প্রধান চরিত্র পেশায় গোয়ালা ভজহরি গোপ ও তার স্ত্রী মোক্ষদা সুন্দরী । তাদের দাম্পত্য কলহ দিয়ে গল্পের সূচনা হয়েছে। গল্পকার প্রভাতকুমার নিম্নবর্গের এক দম্পতির সংসারের নিপুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন-

"প্রভাতকুমার বাঙালি সংসারের নিপুণ কলাবিদ। তাঁর স্নিগ্ধ মমত্বের স্পর্শে আমাদের পরিচিত পারিবারিক জীবনের হাসি কান্না গুলি মনোরম হয়ে দেখা দিয়েছে।"[৬]

'প্রেম ও প্রহার' গল্পের নামকরণের মধ্যেই দাম্পত্য জীবনের কলহ ও মিলনের ইঙ্গিত রয়েছে। পদ্মা তীরবর্তী রায়গঞ্জনামা গ্রামে বসবাস করে গোয়ালা সম্প্রদায়ের ভজহরি গোপ ও তার স্ত্রী মোক্ষদা সুন্দরী।গল্পের সূচনা স্বামী স্ত্রীর উত্তপ্ত বাক্যালাপের মাধ্যমে। উভয়ের কথোপকথনে নিম্নবর্গের ভাষার সার্থক প্রয়োগ করেছেন গল্পকার। ভজহরি উচ্চস্বরে বলে-

" খপর্দার মাগী মুখ সামলে কথা কোস নইলে জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো।"[৭]

ভজহরি স্ত্রীকে জুতা-পেটা করার কথা বললে পাল্টা জবাব দিয়েছে মোক্ষদা। সে বলল-

" ইস! রাগ দেখ পুরুষের! জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবেন। জুতো পাবি কোথা তাই শুনি? বাপের জন্মে জুতো কখনও পায়ে দিয়েছিস রে মিনসে।"[৮]

স্বামী স্ত্রীর বাকবিতণ্ডায় গল্পে ইতর শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মোক্ষদা স্বামীকে সম্বোধন করেছে 'মিনসে' বলে। স্বামী পয়সা রোজগার করতে পারে না বলে সে খোটা দিয়েছে। তার পাল্টা জবাব দিয়েছে ভজহরি। সে স্ত্রীকে 'শুয়োরকে বাচ্ছি', 'মাগী', 'শালী হারামজাদি' বলে সম্বোধন করেছে। তাদের উভয়ের মুখে বহু কথ্য শব্দের ব্যবহার দেখা গেছে। 'ন্যাকা', 'গেরাস', 'শরীলটে', 'গায়ে গতরের', 'নোকের' শব্দ প্রয়োগ রয়েছে। ভজহরি ও মোক্ষদার কলহ বাকযুদ্ধে সীমাবদ্ধ থাকে না, কখনো তা হাতাহাতি পর্যায়ে পৌঁছয়। একদিন মোক্ষদার সঞ্চিত অর্থ গোপনে ভজহরি নিয়ে ছিপ লাগানোর জন্য পিতলের হুইল কিনে আনে। এই নিয়ে সংসারে কুরুক্ষেত্র বাঁধে। ভজহরি স্ত্রীর মুখ লক্ষ্য করে জ্বলন্ত কলিকা ছুঁড়ে মারে। মোক্ষদাও পাল্টা আক্রমণ করে। সে ভজহরির মাথায় সজোরে হুঁকো ছুঁড়ে মারে, পিঠে কয়েক ঘা বসিয়ে দেয়। মাথায় আঘাত পেয়ে মেজাজ বিগড়ে ভজহরি হুমকির সুরে বলল-

" দাঁড়া শালী হারামজাদি; তুই আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিস, যাচ্ছি পুলিশে নালিশ করতে। তিনটি বচ্ছর তোকে যদি আমি জেল না খাটাই তাহলে মিনসের ছেলেই নই।"[৯]

এই হুমকি দিয়ে ভজহরি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। মোক্ষদা ভাবে সত্যিই কি তার স্বামী তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাতে গেছে। রাতে সে স্বামীর জন্য খাবার ঢেকে রেখে নিজে খেয়ে শুয়ে পড়ল। পরদিন বেলা বাড়লেও স্বামী বাড়ি না ফেরায় সে থানায় খোঁজ নিতে যায়। দারোগবাবু জানান যে, রায়গঞ্জ ঘাটে এক ব্যক্তির ধুতি গামছা পাওয়া গেছে।

দারোগা মৃত ব্যক্তির নামধাম ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করল। পরবর্তীতে মোক্ষদা গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় শ্যামবাজারে রামদয়াল মিত্রের বাড়িতে ঝি হিসেবে কাজ শুরু করে। ভজহরি অ্যাটর্নিবাবুর ভৃত্য হিসেবে কাজ করছিল। ঘটনাক্রমে স্বামী স্ত্রীর সাক্ষাৎ হয়। তারা উভয়েই নিজ নিজ কাজে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে আসে। তারা নিজেদের কুটির সংস্কার করে গাভী কিনে জাত ব্যবসা শুরু করে সুখের সংসার করতে লাগলো। দাম্পত্য কলহ দিয়ে গল্পের সূচনা হলেও গল্পের পরিণতি মিলনান্তক।

দুধ মা :

আলোচ্য 'দুধ মা' গল্পে উচ্চবর্গের অন্তঃসারশূন্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, কপটতা ও নিম্নবর্গের কর্তব্য নিষ্ঠা ও সন্তান বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের সূচনা হয়েছে সার্কুলার রোডের উপর বড় বাগানওয়ালা নীলবর্ণের দ্বিতলবাড়ি ও গৃহকর্তার পরিচয় দিয়ে। গৃহকর্তা ডি. ভাদুড়ী মিন্টো মেডিক্যাল কলেজের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক এবং এই কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের বড়কর্তা। ডাক্তার ভাদুড়ী ও তার স্ত্রী বিভাবতী এই গৃহে বসবাস করেন। অর্থ, যশ,খ্যাতি ও প্রভাব প্রতিপত্তির অভাব না থাকলে সন্তানের অভাবে নিঃসন্তান এই দম্পতির মানসিক প্রশান্তি নেই। ডাক্তারবাবুর বাড়ির সদর বারান্দায় এক অজ্ঞাত পরিচয় সদ্যোজাত পুত্র সন্তান পাওয়া নিয়েই গল্পের কাহিনি পরিণতির দিকে এগিয়েছে। সকালে ডাক্তারবাবুকে ঘুম থেকে তুলে বাড়ির ঝি সোনার মা বলল-

" কোন অবাগী শতেকখোয়ারী এমন কাজ করলে মা, তা তো জানিনে! একটা মরা ছেলে এনে, আমাদের সদর বারান্দায় শুইয়ে রেখে গেছে।" [১০]

ডাক্তার গৃহিণীর মতে-

"... এ নিশ্চয়ই কোনও নষ্ট স্ত্রী লোকের কাজ । বিধবা টিধবা কেউ প্রসব হয়েছে, তার আত্মীয় বন্ধুরা গলা টিপে মেরে এইখানে ফেলে রেখে গেছে।" [১১]

গৃহিনীর এই কথা শুনে সোনার মা, যে কথা বলেছে তাতে নিম্নবর্গের ভাষার সার্থক নিদর্শন মিলে সে বলেছে-

" তাই হবেক গো, তাই হবেক। পুলিশে খবর দাও মা, তারা ধরে নিয়ে গিয়ে হারামজাদি নচ্ছার মাগীকে ফাঁসি দিক।"[১২]

ডাক্তার বাবু শিশুকে দেখে বললেন যে, শিশুটি মৃত নয় জীবিত। গৃহিণী শিশুকে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিষয়টি পুলিশকে জানিয়ে নিঃসন্তান ডাক্তার দম্পতি শিশুকে নিজেদের কাছে রেখে দিলেন। এই দম্পতি শিশুকে খোকা বলে ডাকেন।

ডাক্তাবাবু হাসপাতালেই খোকার দুধ মার সন্ধান পান। তার নাম ফুলটুসিয়া,জাতিতে দোষাধ, বাড়ি পাটনা। বাবা মারা যাওয়ার পর শিয়ালদহের কাছে মামার বাড়িতে তারা বসবাস করে। ফুলটুসিয়া খোকাকে দুধ পান করায়। সে খোকাকে আপন সন্তানের মত স্নেহ করে। খোকাও তাকে ছাড়া থাকে না। ইতিমধ্যেই খোকা এক বছরের হয়েছে। সে দুধ মাকে 'ফুলি- মা' বলে ডাকে। খোকার বয়স দুই বছর হলে ফুলি সন্তান সম্ভবা হয়। ডাক্তারবাবু এবার ফুলিকে বিদায় করলেন। ফুলির খোকাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না। সে কান্নার সুরে বলল,

"খোকাকে ছেড়ে আমি কেমন করে থাকবো মা? কেমন করে আমার মুখে ভাত জল রুচবে ?" [১৩]

ফুলির এই উক্তিতে তার মাতৃ হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। খোকাও রাতে ফুলি-মা যাবো বলে কান্না করে। আশ্বিন মাসে ফুলির পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এদিকে ফাল্গুন মাসে খোকা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। এই খবর শোনামাত্র ফুলি সব বাধা উপেক্ষা করে খোকার কাছে ছুটে আসে। কিন্তু যথাযথ চিকিৎসার পরেও খোকা বাঁচলো না। খোকার মৃত্যুতে ডাক্তার গৃহে শোকের ছায়া। এদিকে ফুলি বিলাপ করে বলে-

"ওরে আমার ধন রে, আমার বুকের কলজে রে, আমায় ছেড়ে তুই কোথায় চলে গেলি রে?" [১৪]

খোকার মৃত্যুর পর তার শেষকৃত্য খ্রিস্টীয় ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী করার জন্য পাদ্রীসাহেব ডাক্তারবাবুর কাছে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাতে ডাক্তার ভাদুড়ী আপত্তি করেন। তিনি বলেন যে, আমি তার জনক না হলেও পিতা। তখন পাদ্রী সাহেব জানান যে, আমি তার পিতামহ। পাদ্রী সাহেব খোকার জন্মরহস্য উন্মোচন করে জানান যে, তাঁর পুত্র জোসেফের ঔরসে ফুলির গর্ভে খোকার জন্ম। খোকার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হওয়ার পর গল্পের সমাপ্তি ঘটে।

বন্য শিশু :

প্রভাতকুমারের 'বন্য শিশু' গল্পটি তাঁর 'ষোড়শী' গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকার ১৩০৭ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ্য সংখ্যায়। গল্পের প্রধান চরিত্র কুমুদনাথ ডাক্তারের পরামর্শ মেনে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য শীতঋতু যাপন করতে স্ত্রী গিরিবালা ও দুই বছরের শিশুপুত্রকে নিয়ে সিমলা যাত্রা করেন। সিমলা কালেক্টারি অফিসে কুমুদবাবুর সতীর্থ যদু বাবু ছিলেন। সেখানে থাকার ভালো বন্দোবস্ত হয়। একদিন কুমুদবাবু তারাদেবী মন্দিরে পুজো গিয়ে মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে গল্প করার সময় এক পাহাড়ী শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। পুরোহিত জানান যে, দুদিন আগে সেই ছেলেটিকে কুড়িয়ে পেয়েছেন। কুমুদবাবু ছেলেটিকে মানুষ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি স্ত্রীকে বলেন-

"দেখ এরা অসভ্যজাতি, এদের কি ছেলে হারালে কোন দুঃখ আছে? তাহলে মা আসত, নিয়ে যেত। এখানে থাকলে ছেলেটি দু'দিনে মারা পড়বে।" [১৫]

শিশুটিকে বাড়ি আনা হলো, তার নাম রাখা হয় বুনো। খোকার সঙ্গে বুনোর বেশ ভাব জমে উঠল। তার সঙ্গে সারাদিন খেলাধুলা করল। কিন্তু পরের দিন সে জ্বরে আক্রান্ত হল। তার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার আনা হলো। কিন্তু দুদিন পর গিরিবালার কোলে বুনোর মৃত্যু হল। বুনোর অকাল প্রয়াণে ভীষণ কষ্ট পেল এই দম্পতি। বুনোর মৃত্যুর পর এক পাহাড়িয়া রমণী বাসায় ঢোকার চেষ্টা করলে ভৃত্য বিশুয়া তাকে ধরে ফেলে। একদিন খোকাকে নিয়ে বিশুয়া ঘুরতে যায় তখন এই পাহাড়িয়া রমণী খোকাকে আক্রমণ করে। পুলিশ এই রমণীকে ধরে থানায় নিয়ে আসে। কুমুদবাবু পুলিশের কাছে জানতে চান তার ছেলেকে আক্রমণের কারণ কি, উত্তরে দারোগা বলল-

" ও বলে, তারাদেবী পাহাড়ে ওর ছেলে হারাইয়া গিয়েছিল, আপনি আনিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন, তাই ও প্রতিশোধ লইতে চাহে।" [১৬]

কুমুদবাবু অবাক হন। পরের দিন খোকা খেলাধুলা করে ঘুমিয়ে পড়ে। এমন সময় সেই রমণী বিদ্যুৎ বেগে ঘর থেকে তাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। "সেই সর্বনাশী লেপচা- রমণী; কিছুক্ষণ পূর্বে রক্ষীকে হত্যা করিয়া গারদ হইতে পলাইয়া আসিয়াছে।" [১৭]

এই লেপচা রমণী বিশুয়ার গলদেশ ছিন্ন করে ঘরে ঢুকে খোকাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছে। এইভাবে ট্র্যাজিক পরিনিতির মাধ্যমে গল্পের সমাপ্তি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সমাজবাস্তবতা অঙ্কনের নিপুণ কারিগর। তিনি জীবন জীবিকার তাগিদে ব্যক্তিগত জীবনে নানা পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি পেশাগত জীবনে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশেছেন। তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে তিনি তাঁর ছোটগল্পের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করছেন। " তাঁর ছোটগল্পগুলি চলতি জীবনের এক-এক টুকরো ভাসমান ছবি।" [১৮]

তিনি জীবনে নিজের দেখা বাস্তব ঘটনাগুলো ছোটগল্পে বাস্তবসম্মত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই সমাজের চলমান চিত্র তাঁর গল্পে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সমাজের নিম্নবর্গের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনকথা অত্যন্ত দরদের সঙ্গে তিনি গল্পের মূল উপজীব্য করেছেন। তিনি তাঁর গল্পে অধ্যাপক, চিকিৎসক,হাকিম, উকিল,জেলার,পত্রিকা সম্পাদক সহ উচ্চবর্গের পেশার মানুষের পাশাপাশি মুটে, মজুর,ঠেলাওয়ালা,ঝি, চাকর,দারোয়ান, ডোম, মাতাল সহ অন্যান্য নিম্নবর্গের পেশার মানুষের চরিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফসল তাঁর গল্পে বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছে। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এমনকি দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে বিদেশের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাঁর ছোটগল্প তৎকালীন সমাজের জীবন্ত দলিল। " বিশ শতকের প্রথম পাদে বঙ্গ-বিহার- উত্তর প্রদেশের ধনী-দরিদ্র মধ্যবিত্ত ভারতীয়দের সামাজিক জীবনের বাস্তবচিত্ত তিনি অঙ্কন করেছেন।" [১৯]

ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরেই তিনি বাস্তবসম্মত ভাবে চরিত্র নির্মাণ করেছেন। চরিত্র উপযোগী ভাষা ব্যবহারে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি তাঁর ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষের পেশার সঙ্গে ভাষার সার্থক প্রয়োগ করেছেন। তাই একবিংশ শতাব্দীতেও প্রভাতকুমার সমান জনপ্রিয়।

উল্লেখপঞ্জি:

১। দাশ শিশিরকুমার: বাংলা ছোটগল্প, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ষষ্ঠ সংস্করণ- আগস্ট ২০১২, পৃষ্ঠা:১৫১।

২। মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার: গল্প সমগ্র (২য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ- আষাঢ় ১৪২৫, পৃষ্ঠা:৩৮৪।

৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা:৩৮৫।

৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা:৩৮৯।

৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা:৩৯০।

৬। গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ: বাংলা গল্প বিচিত্রা, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭৩, সপ্তম মুদ্রণ- ভাদ্র,১৪২১, পৃষ্ঠা: ২৬।

৭। মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার: গল্প সমগ্র (২য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ- আষাঢ় ১৪২৫, পৃষ্ঠা:৩৯২।

৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৯২।

৯। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৯৩।

১০। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৬০০।

১১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৬০০।

১২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৬০০।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৬০৬।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৬০৭।

১৫। মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার: গল্প সমগ্র (১ ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ- আষাঢ় ১৪২৫, পৃষ্ঠা:২০৮।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা:২১০।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা:২১০।

১৮। চৌধুরী শ্রীভূদেব: বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা:লি:, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ- ২০১৭-২০১৮, পৃষ্ঠা:১৫১।

১৯। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার: কালের পুত্তলিকা ,দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, চতুর্থ সংস্করণ- জুন ২০১৫, পৃষ্ঠা:১৩৮